পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে : ব্যক্তি মানুষের চিরন্তন সংকটের আখ্যান

মা সু দ রা না

[পুনশ্চ : করোনা কালে অনেকগুলো বই পড়ে ফেলেছি। আসলে রুটি-রুজির দৌড়ে পড়ার অবারিত সুযোগ কোথায় আমার জীবনে। এর পরেও প্রতিদিন আমাকে কিছু না কিছু পড়তে হয়। কিন্তু করোনা কালটা শুধু পড়ার জন্য অনেক সময় করে দিয়েছে।

আমার পড়ার ক্ষেত্র বহু বিচিত্র্য। তবে প্রবন্ধ আমাকে বেশি টানে। কবিতা পড়ি...। তবে কয়েক বছর থেকে বেশি পড়ছি রাজনৈতিক সাহিত্য। অনেক দিন পর একটা উপন্যাস পড়লাম। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছি উপন্যাসটি পড়ে। হতবাক হয়েছি ভাষা শৈলির মুগ্ধতায়। যে লেখকের এসএসসির পাশের পর প্রথম প্রবন্ধের বই পড়ে প্রিয় লেখকের তালিকায় নাম যুক্ত করেছি, তিনি কথাসাহিত্যেও আমার প্রিয় হবেন, একটি উপন্যাস পড়ে--সেটা কয়েকদিন থেকে ভাবছি। উপন্যাসটি পড়া শেষ করেছি দুই-তিন মাস আগে। কিন্তু এর ঘোর কাটাতে পারছিলাম না। আমি আসলে চট জলদি কোন বই পড়ে লিখতে পারি না। হজম করি আগে। আর মাঝে মাঝে বইয়ের দাগ দেওয়া অংশে চোখ বোলাই।]

মূল উপন্যাসের আলোচনা

"... বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-বিভূতিভূষণ-মানিক-সতীনাথ চরিত্রের বহিরাঙ্গিন ক্রিয়া ও অন্তর্জগতকে ঘিরে কাহিনি বর্ণনার যে উদ্ভাবন চালিয়ে গেছেন, তা তরল হতে হতে এখন ঘটনা বর্ণনায় পর্যবসিত। এই কিছু দিন আগে জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত উপন্যাসগুলিতে আমরা আবিস্কার করি নতুন সময়ের উপন্যাস নির্মাণের প্রশ্ন, ন্যারোটিভের পথে যার উত্তর মেলে না। বাংলা সাহিত্যে-- মাল্যবান সেই উপন্যাস যা বিজ্ঞানে কোয়ান্টাম বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। ঘটনা নয়, মন নয়,, জীবনানন্দের অধীত বিষয় মানুষের অস্তিত্ব। রণ রক্তক্লান্ত এই সভ্যতায় তাঁর প্রশ্ন : অস্তিত্ব কী? কী অর্থ অস্তিত্বের? কী এর সম্ভাবনা?"

উপরোক্ত কথাটি কথা সাহিত্যিক রবিশংকর বল- এর। তিনি জীবনানন্দ দাশের কথা সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কথাটি বলেছেন। আর আমি আকিমুন রহমানের 'পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে একই কথাটি বলতে চাই।

কেন উপন্যাসকে আমরা জীবনের সবচেয়ে কাছাকাছি শিল্প হিসেবে গণ্য করি? এই জিজ্ঞাসার উত্তর একটিই, তা হলো-- জীবন ও জগতের ন্যায়সূত্র ধারণে উপন্যাসের মতো মহত্ব আর কোনো শিল্পে নেই। জীবন ও জগতের গভীরতর অধ্যায় ন্যায়-অন্যায়ের, আদর্শ-অনাদর্শের, সুন্দর-অসুন্দরের, উচিত- অনুচিতের যে অনন্য নিরপেক্ষতার পটভূমি লক্ষ করা যায়, উপন্যাস সে-জীবনেরই বয়ান, বলা যায়। এই কনটেক্সট ধর্মের নয়, মতাদর্শের নয়, এমনকি আবেগেরও নয়-- সমগ্র বিষয়টিই হলো জীবনের। উপন্যাসই একমাত্র শিল্প, যেখানে জীবন তার আপন স্বভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই যে আপন স্বভাব-- এর জন্যই উপন্যাস বিধানসংবদ্ধ নয়। প্রতিটি উপন্যাসই একটি স্বতন্ত্র স্বভাবে গড়ে ওঠে, একটি স্বতন্ত্র জগৎ ও জীবন সেখানে তার সব সৌষ্ঠব নিয়ে তৈরি হয় অথবা জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে, বিকশিত হয়, বিপুলতা লাভ করে এবং সেই জীবন ও জগতের ভেতর উচ্চার্য-অনুচ্চার্য বহুতর জীবন ও জগতের কথামালা রচিত হয়।

নিজ অস্তিত্বকে ঘিরে ব্যক্তির যে যন্ত্রণা ও সংকট, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুকে মিলিয়ে সত্তার যে অনিঃশেষ জিজ্ঞাসা, মানুষের চেতনা-দর্পণে জীবন-রহস্যের সেই চিরায়ত অনুভবগুলো এক অভিনব শিল্পের রূপ পেয়েছে— আকিমুন রহমানের 'পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে' উপন্যাসে। উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে ব্যক্তিসত্তার এক করুন ট্রাজেডি। জটিল অথচ গভীর চেতনালোকের আলো-ছায়ায় ব্যক্তি-মানুষের পথ চলার এক আশ্চর্য-- ইতিকথা হয়ে উঠেছে শেষ পর্যন্ত। যেন এক বহতা জীবনের গল্প, যে জীবনের

স্রোত শুধু দু-একটি উত্তাল তরঙ্গের সংঘাতে বিক্ষুব্ধ নয়, আপাত বিচ্ছিন্ন অনেক ছোট ছোট ঢেউয়ের সমষ্টি। মূলত প্রধান চরিত্র শামীমাকে ঘিরে উপন্যাসের পটভূমি এগিয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত শামীমাই মুখ্য চরিত্র হিসেবে এর কাহিনীর যবনিকাপাত ঘটিয়েছে। আসলে শামীমা এখানে নায়িকা হলেও এ চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাঙালী সমাজের সব কালের নারীদের সমস্যার উন্মোচন করা হয়েছে। কালে কালে বাঙলা সাহিত্যে নারীদের বিভিন্ন সমস্যা, মনস্বত্ব নানা উপন্যাসিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু আকিমুন রহমানের মুন্সিয়ানা এ উপন্যাসে অন্য ক্ষেত্রে। আমার মনে হয়, তিনিই বুঝি নারীদের এক বিশেষ বেদনা, সমস্যা যা মনুষ্য সমাজ তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রকাশযোগ্য বিষয় নয়— এমন এক সমস্যা, যা শুধু নারীরা জীবনের একটা সময় পর্যন্ত অন্তর্গত বেদনা নিয়ে কুকড়ে ও যন্ত্রণা নিয়ে সময় অতিবাহিত করে। এ ক্ষেত্রে নারীর ওই বিশেষ সময়ের যন্ত্রণা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের কাছে কৌতুক বা উপহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়। আবার অনেক পুরুষ এ বিষয়টাকে কোন যন্ত্রণা বলেই মনে করতে পারেন না।

শত বছরে সমাজের মধ্যে প্রবহমান টাবুকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন উপন্যাসিক। সমাজ, সংসারে চলমান ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নারীত্বের এ যন্ত্রনা, ব্যথা কত জন পুরুষ মানুষ বিষয়টি নিয়ে অবহিত বা ভাবিত-- এ নিয়ে আমার মধ্যে ঘোরতর সংশয় আছে। আসলে এ উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপট হলো-- নারীদের ঋতুস্রাব নিয়ে। এ সব বিষয় বাঙালি সমাজে এখনো গোপন, লজ্জার বিষয়। সমাজে বিরাজমান সংস্কারের কারণে এখনো অনেক নারী এ বিষয়টাকে গোপন কথা হিসেবে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রকাশযোগ্য মনে করেন না। তাই সারা জীবন নারী গোপন ব্যথা নিয়ে গুমরে জীবন পার করে, তারপরও কোন পুরুষের কাছে প্রকাশ করতে পারেন না।

এ উপন্যাসে শামীমা যেন আমাদের সমাজের হাজার হাজার, লক্ষ, কোটি নারীর প্রতিনিধি হিসেবে তার অন্তর্গত বেদনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ঋতুস্রাবের কষ্টদায়ক বর্ণনাটি শামীমা এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন— '... বেঁচে থাকাকে আমার কাছে কখনোই খুব বেশি সুখকর কিংবা আবেগে ফেনিয়ে ওঠার বিষয় বলে হয় না, আবার বেঁচে থাকতে না পারাকেও মহা কোনো কষ্টের ব্যাপার বলে মনে করতে পারি না আমি। তবে পিরিয়ডের সময়টুকুকে আমার বেঁচে থাকার বড়ো দণ্ডভোগ বলে বরাবর মনে হয়ে আসছে। কী বিচিত্র পীড়নই না আমাকে ভোগ করতে হয় পাঁচদিনের প্রতি দিন। অবশ্যি যন্ত্রণাভোগ শুরু হয় ওই পাঁচ দিনের বহু আগ থেকে। পিরিয়ড শেষ হবার সপ্তাহ দুয়েক পরে একটা ব্যথার হিংস্র হাত থেকে মুচড়ে দিতে থাকে আমার নাভির নিম্নাংশের অভ্যন্তর প্রদেশ...'।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে গ্রাম বিচ্ছিন্নতা দিয়ে। শামীমা একটা এনজিও-তে চাকরি পায়। চাকরির ঘটনা দিয়ে উপন্যাস শুরু হলেও তার জীবনে এ পর্যায়ে পৌছাতে, অনেক সংগ্রাম করে এখানে আসতে হয়েছে। দেখতে সুন্দর না হওয়ার কারণে পরিবারের মা, বাবা, দাদীর কাছ থেকে অন্য ভাই-বোনদের চেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। যার বর্ণনা উপন্যাসটির পরতে পরতে আছে। যেমন—

'...নান্টু আমার পৃথিবীকে ভরে দেয় অঢেল ঘৃণা আর বিস্ময়ে। নান্টু আমার মহাবন্ধু, নান্টু আমার দুবছরের বড়ো ফুফাতো ভাই, খিকখিকে নোংরামো দিয়ে আমাকে নোংরা করে দেয় ওইই প্রথম। আমার বন্ধু নান্টু'...

'...আমিনুইল্যা হারামজাদা আমি ঘুমাইলেই আইয়া আমার বুকে হাত দেয়। আমি গোসল করতে গেলে দরজার ফুটো দিয়া ফুচকি দিয়া থাকে। শুয়োরের বাচ্চা। তুই না আমার মামা।'

গ্রামীণ সমাজে পরিবারের অভিভাবকরা যে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের পড়াশোনার বিষয়ে বেশি আগ্রহ, যত্মশীল তা উপ্যাসের নিম্নোক্ত শামীমার বয়ানে আচ করা যায়। যা চিরাচরিত পরিবারের মেয়েদের প্রতি বৈষম্যের চিত্র ফুটে ওঠেছে। '... মফিজ স্যারের কাছে আমরা তিন ভাই বোন রোজ বিকেলে পড়ি। মফিজ স্যারকে রাখা হয় রতন, খোকনের জন্য। রতন, খোকনকে আব্বা রাতে অনেকক্ষণ ধরে পড়ালেও , ওদের বিকেলের দুষ্টুমি বন্ধ করার জন্য আব্বা স্যারকে ঠিক করেন। কিন্তু আমার জন্যে মাস্টার রাখার কথা কারো মনে পড়ে না, আমি একা ক্লাস সেভেনের পাটীগণিত নিয়ে হিমসিম খেতে থাকি, আব্বা

তা দেখার সময় পান না। আম্মা নিজে নিজে পড়ার উপদেশ দেন, '...যার অয়-- , এমনেই অয়, স্কুলে কি করস, বালা কইরা কেলাশে বুইজ্যা লইতে পারস না... '

দাদীর জবানীতে শামীমাকে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—

'... আমাগো বাইত এই পড়ালেহা কোন কামে লাগব, চুলা গুতান ছাড়া মাইয়া লোকের আর কুনু গতি আছে...' এ রকম আরও অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে উপন্যাসের পড়তে পড়তে। আমি যদি বলি নারীর শত্রু পুরুষের চেয়ে নারী নিজেই, তাহলে কি বেশি বলা হবে। কারণ এ উপন্যাসে শামীমার যে সংগ্রাম এবং জীবন সংগ্রামের লক্ষ্যে পৌছানের জন্য যে অবিরাম অধ্যবসায়; সেখানে তার সহযাত্রী বা সহযোগী এবং উৎসাহ দাতা হিসেবে পরিবারের অন্য কোন নারী, মা, দাদী ও বোন কাউকেই পাওয়া যায় না। এখানে একাকী, নিঃসঙ্গ সারথী হয়ে একাই তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই শৈশব থেকে চাকরি জীবনের পুরো সময়টা তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে।

মনুষ্য জীবনে প্রেম একটা স্বাভাবিক বিষয়। এ বিষয়টাকে কোন নিয়ম-নীতি, সমাজ প্রচলিত কোনো নৈতিকতায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। শামীমা এ সম্পর্ক করতে গিয়ে প্রেমিক কর্তৃক প্রতারণার শিকার হয়েছে। আসলে সে পড়াশোনা শেষ করার পর চাকরির কর্মস্থল সূত্রে এক পুরুষের প্রেমে পড়ে। তার নিজের জবানবন্দিতে--- 'এনজিও-তে কাজ পাবার পরপরই আমি এটিএম মনিরুল ইসলামের প্রেমে পড়ে যাই। প্রেমে পড়ার আগে বিষয়টি আমার কাছে বড়ো চাঞ্চল্যকর মনে হতো, প্রেমে পড়ার পর দেখি এখানে কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই।...'

আসলে প্রেমে পড়ার পর থেকে বা সম্পর্ক চলাকালীন পুরো সময়টা উপন্যাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট, আমার কাছে মনে হয়েছে। উপন্যাসটিকে পরিণতির দিকে ক্রমশ নিয়ে গেছে এ প্রেক্ষাপটটি। কারণ, নারী এখানেও পরিস্থিতির শিকার। পুরুষ এখানে প্রতারক প্রেমিক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে-- যা আমাদের চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে এনেছে শামীমা নামক এক সংগ্রামী নারীর নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের এ জায়গাটিকে তাৎপর্যমন্ডিতভাবে ফুটিয়ে তোলার মুন্সিয়ানা এককভাবে লেখকের। এখানে লেখকের মেধার তারিফ করতে হয়। বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত উপন্যাসের যে ধারা, সেখানে লেখক ব্রেকথ্রু করতে পেরেছেন বলে আমার নিজস্ব মতামত।

নর, নারীর সম্পর্ক চলাকালীন পারস্পরিক বোঝাপড়া, বিশ্বস্ততা এবং সম্মতির জায়গা থেকে এক সময় দুজন মানুষ কাছাকাছি চলে আসে। এটা তো জৈবিকতার অন্যতম বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। আবার সম্পর্কের পরিণতির বা সৎ সম্পর্কের অন্যতম মানদন্ড। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পুরুষরা মেয়েদেরকে শুধু শারীরিক বা জৈবিকতার জায়গা থেকে সম্পর্ক নির্মাণ করে থাকে-- এখানে দায়টা শুধু নারীর, পুরুষের কোনো দায় যেন নেই। উপন্যাসের এ জায়গায় সম্পর্কের পুরো দায়-দায়িত্ব যেন শুধু শামীমার। এখানে প্রেমিকের যেন কোন দায় নেই। শামীমা তখন বলে—

'... হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে, আমার শরীর ব্যাপারটি পছন্দ করা শুরু করেছিলো। কিন্তু সে ওই পছন্দের শেষের নিখর প্রাপ্তিকে নিজের মধ্যে দেখতে পায়নি। সে কিছুই বোঝেনি, না পুলক না উচ্ছ্বাস না অন্ধ উতরোল মাতামাতির বিপুল ক্লান্তির সুখ--কিছুই পায়নি সে। কিন্তু আমি একটা আকাশ ছুঁয়ে যাওয়া, মহাগর্জনশীল, ভারী, প্রবল গতিতে ছুটে আসা বিশাল ঢেউকে শরীরের কোন সুদূর অন্ধকার থেকে জেগে উঠতে দেখেছিলাম। অনিচ্ছা, আপত্তি, অপ্রস্তুত শরীরে হঠাৎ বিঁধে যাওয়া মাংসের প্রবল ধস্তাধস্তির টানাহেচড়াঁ-- সব ছিলো, তার নীচে আমার ভেতর আমার জন্যে জেগে ওঠা ঢেউ ছিলো। তার জন্যে জেগে ওঠা ঢেউ ছিলো।' শামীমা ও মনিরুল ইসলাম সম্পর্ক চালাকালীন এক সময় শারীরিকভাবে মিলিত হয়। অবশ্য এ মিলনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মতির চেয়ে মনিরুলের কৌশলী ভূমিকা এবং অনেকখানি জোরজবরদস্তির বিষয় ছিল। কিন্তু শামীমা যখন তার শরীরে ভ্রুণের অস্তিত্ব টের পায় এবং মনিরুল তখন সে দোষ অন্য পুরুষের ফল হিসেবে ঘটানাটি হাজির করে আর দায় অস্বীকার করে; এ ঘটনার পর থেকে শামীমার জীবনে নতুন এক বিভীষিকাময় অধ্যায় শুরু হয়। এখানেও শামীমা এক নিঃসঙ্গ লড়াকু নারী। তার জীবনে নতুন এক লড়াকু অধ্যায়ের শুরু হয়। এ অবস্থায় শামীমা সগোক্তি করে বলে— '...আমার জীবন, কেনো বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু তোমার পাওয়ার নেই? এতো যুদ্ধের ভার, এতো যুদ্ধে যাবার ভার তোমার ওপরই কেনো-- তোমার চারপাশে, সকল জীবনে ঘন হয়ে বেজে ওঠে পরিতৃপ্তির ধ্বনি। সকলেই পরিতৃপ্ত, সকলেই নির্বিঘ্ন, সকলেই তুমুল সুখের ভেতর বসবাসরত;

শুধু তুমি কেনো কোনো দিন নির্বিঘ্নতার মুখোমুখি হতে পারলে না! কেনো শুধু বিঘ্ন ও বিপন্নতার এক এলাকা পেরিয়ে বিঘ্ন ও বিপন্নতার অন্য আরেক এলাকায় পৌঁছানোই তোমার নিয়তি! অন্য সকল জীবনে কেবলই রোদ ঝলমল ফালউন দিন, তোমার জন্যে কেবলই ঘোর কুষ্মটিকা আর অন্তহীন নিম্নচাপের ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিপাত! কেনো...'

যখন মনিরুল ভ্রুণের কোন দায়িত্ব নিল না, তখন শামীমার জীবনে নতুন এক বিড়াম্বনা হাজির হলো। প্রেমিক পুরুষের আসল চরিত্র তার কাছে খোলাসা হতে খুব বেশি সময় লাগলো না। এরপর সমাজ ব্যবস্থার মানুষের কাছে নিজের চরিত্র ভালো রাখার জন্য ভ্রুণটাকে নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। উপন্যাসিক এখানে অনেকখানি আপোষ করতে বাধ্য হলেন। শামীমা তো ভ্রুণ হত্যা না করে, তার দায়িত্ব নিতে পারতেন। সমাজ সিদ্ধ হাজার বছরের প্রথাকে একটা ফাইট দিতে পারতেন। সেটা একটা বিপ্লবাত্মক বিষয় হিসেবে দাড়াতো।

এরপর শামীমা রাজধানী শহরে গিয়ে এ্যাবরশন করতে বাধ্য হন। এটাই কি নারীর নিয়তি! একজন পুরুষের আনন্দের ফল কেন শুধু নারী ভোগ করবে— এ প্রশ্ন বারবার উচ্চারিত হয়েছে। আর তার শরীরের ওই অনাকাঙ্খিত মাংশপিন্ডটিকে বিচ্ছিন্ন করতে কতো যে লড়াই করতে হয়েছে— তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে সময় শামীমার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। এ দুঃসময় তার প্রেমিক পুরুষটি সুকৌশলে তাকে এড়িয়ে চলে। তার দায়-দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে যায়। অবশেষে শামীমা বাধ্য হয়ে চাকরির প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নিয়ে, তার এ কাজের সব লেন-দেন মিটিয়ে দেয়।
শেষে একরাশ জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা আর বিষন্নতা নিয়ে উপন্যাসের যবনিকাপাত ঘটেছে, তার কথা দিয়ে এভাবে—
'... আমার শরীর, আমি তোমাকে মেনে নিতে বাধ্য করেছি কী বিপুল দুর্দশা। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমার শরীর, আমি তোমাকে সহ্য করতে বাধ্য করেছি কতো ইতরের দলন-পীড়ন। আমি তোমাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাকে তুম ক্ষমা কোরো। আমার শরীর, আমি তোমাকে ফুঁসলে পাঠিয়েছিলাম ভুল পথে, প্রেম যার নাম; ওই পথে তোমাকে বিদ্ধ হতে হয়েছে অগুনতি কন্টকে, তোমাকে তলিয়ে যেতে হয়েছে নরকের তপ্ত লাভার নীচে। আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারিনি প্রতারকের সম্মোহন থেকে। আমার মোহকে ক্ষমা কোরো। আমার শরীর, এখন আমার ভুল তোমাকে ঠেলে এনেছে এ্যাবরশন টেবিলে, দ্বিতীয়বারের মতো, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি বুঝতে পেরেও লোভে অন্ধ থেকেছি, দেখতে পেয়েও মোহে আচ্ছন্ন থেকেছি, আমি বদমাশকে ভেবেছি শুদ্ধ সুন্দর। আমার মোহ, লোভ, লালসাকে ক্ষমা কোরো। আমি তোমাকে ঠেলে দিয়েছি ভালোবাসা আর সংসারের লোভে কপট বিকারগ্রস্ত দুপেয়ে এক অদ্ভুত জন্তুর দিকে। আমি এক জ্যান্ত খুদে মাংসপিণ্ডের জন্যে তোমাকে মেনে নিতে চাপ দিয়েছি মানুষ হয়ে উঠতে ব্যর্থ হওয়া এক বিকারগ্রস্ত জন্তুর বিকৃতি আর লালসার পীড়ন। তুমি বাঁচো এবার অগাধ সুস্থতার ভেতর। বাঁচো মানুষ বাঁচো তোমার পৃথিবীতে...'।

এবং শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখোড় পেরিয়ে শামীমা আপাতত এ সংগ্রামে জয়ী হয়।

উপন্যাসটিতে মূল ঘটনাপ্রবাহের পাশাপাশি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কথা এসেছে। এনজিও যে বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ফান্ড নিয়ে এসে এ দেশের গরীব-দুখি মানুষের জন্য মায়া-কান্নার রাজনীতি করে— সে বিষয়টি উপন্যাসিক দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শামীমার অন্তঃরঙ্গ বেদনার আরও কিছু কথা তিনি তুলে ধরেছেন, যা একত্রে তুলে ধরা যেতে পারে—

1. আমি নিজেই নিজেকে অবরুদ্ধ করে রাখি; লুকিয়ে থেকে রক্ষা পেতে চাওয়ার এই ব্যবস্থা আমাকে সুখী করে না।

2. এক সময় আমার জন্যে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে বের করি আমি নিজেই।

3. আমি নিজের জন্য গড়ে তুলি প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

4. আমার একলা থাকা, নিজেকে নিরাপদ করে তোলা ভঙ্গুর ব্যবস্থাটুকু ক্ষিপ্ত করে তুলেছে আমার চারপাশের চরিত্রবান সামাজিকগণকে।

5. কোনো পড়শীর পারিবারিক জীবনের সঙ্গে না জড়িয়ে, মুষ্টিমেয় দু'একজনের সঙ্গে মৃদু সৌজন্যের সম্পর্ক রেখে আমি বাস করি এ চত্বরে একা, মূখ ও বধির।

উপন্যাসটির অন্যতম বৈশিষ্ট হলো— এর ভাষা শৈলী। উপন্যাসটির পড়তে পড়তে মনে হবে, এ যেন কাব্যগাথা। কাব্যিকতা এ উপন্যাসকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

আর উপন্যাসটি পাঠ শেষে আমার নিজের কাছে প্রশ্ন জেগেছে যে, 'ব্যক্তি নারী কী শেষ পর্যন্ত অসহায় ও পরাজিত!' শামীমার জীবনের এতো সংগ্রামের পরেও সে কিন্তু উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্গ, একাকী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাহলে এতো লড়াইয়ের ফলাফল হিসেবে শামীমা তার—ব্যক্তির মুক্তি বা সমাজের অচলায়তন ভাঙাতে কী কোন ভূমিকা পালন করতে পেরেছে? পারেনি। আমার কাছে মনে হয়েছে— এটাই এ উপন্যাসের সীমাবদ্ধতার জায়গা।

শামীমা জেনেছে অনেক মূল্য দিয়ে... জীবন এক উপলব্ধি, এক দর্শন, মুক্ত চিন্তার উড়ান। যাপনের প্রতি অনুভবকে স্পর্শ করা। এর নাম-- মুক্ত জীবন। এই মুক্তি সে বুঝেছে-- নিজের কাছে নিজের মুক্তি। আমাদের সমাজে মেয়েরা সে মুক্তির স্বাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত। সুদীর্ঘকাল ধরে চলছে এই বঞ্চনা। এই বঞ্চনা থেকে মুক্তির গালভরা নাম হয়েছে-- নারীমুক্তি। সে মুক্ত নয়। শামীমা চায় সেই মুক্তি-- যার অর্থ নিজের ইচ্ছেডানায় ভর করে নিজের পছন্দমতো উড়তে পারা। সমাজ সেখানে নাক গলাবে না! ডানা ভাঙতে চাইবে না, ভয়ংকর দৈত্যের মতো। জীবনকে বাজি রেখে প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে এক নতুন সত্যের জন্ম দিতে চায়।

তা সত্বেও সাধুবাদ জানাই লেখককে, নারীমুক্তির পথানুসন্ধানে পাঠকদের উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন বলে। আজও এই প্রক্রিয়া প্রাসঙ্গিক বলে!

আকিমুন রহমান